শামসুর রাহমান স্মরণ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কবির মৃত্যু, কবিতার পুনর্জন্ম : শামসুর রাহমানের কবিতা নিয়ে কয়েকটি অসম্পূর্ণ কথা

এক

১৭ই আগস্ট ২০০৬,—প্রয়াত হলেন কবি শামসুর রাহমান। দিনপঞ্জির তারিখটা পূর্বনির্ধারিতই ছিল, আমাদের অজ্ঞাতে। তারিখটা পূর্বনির্ধারিতই ছিল, আমাদের অজ্ঞাতে। তারিখটার দিকে তাকাতেই একটা আমোঘ সত্য জেগে উঠল : কবির মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সেই মৃত্যুর ছাই থেকে নতুন করে জন্ম নেয় তাঁর কবিতা। তাঁর শেষতম উচ্চারণ ঘটে গেছে, হয়তো কালান্তরে প্রকাশ্য হলেও হতে পারে তাঁর এ যাবৎ অপ্রকাশিত কিছু রচনা, কিছু কবিতা, টুকরোটাকরা গদ্য, কিংবা ছড়ানো - ছিটানো চিঠিপত্র। কিন্তু আপাতত এ-সত্যটাও তো উপেক্ষণীয় নয় যে আর তিনি লিখবেন না, উচ্চারণের অনেক দূরেই চলে গেলেন তিনি, মৃত্যুর কাছে সমর্পণ ঘটে গেল তাঁর, কিন্তু সেই মৃত্যুর শ্মশান থেকেই যে আবার ক্রমশ তৈরি হতে থাকবে তাঁর যাবতীয় কবিতা সন্তানের আঁতুড়ঘর, সময় - উত্তীর্ণ মূল্যায়নের নিরিখে যে প্রসবগৃহ থেকে আবির্ভূত হবে অনেক পুরনো কবিতার নতুন ব্যাখ্যা, এ-সত্যটাকেও, এ-সত্যটাকেও আমাদের গ্রাহ্যতা দিতে হবে আমরা জানি। প্রাকৃতিক পরম্পরা মেনে যেমন নিশান্তে একটা নবীন ভোরের জন্ম, এও তেমনি। কবির মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তাঁর কবিতার পুনর্জন্ম, পুনরুজ্জীবন। জন্ম আর মৃত্যু তাঁর কাছে সমান্তরাল দু সত্য, সত্য আমাদের কাছেও : 'এই যে ছড়ানো কথার কালো/ দুরাশায় আজো জোনাকি - জীবন, কখনো তারা/ দূরের শরতে স্মৃতিগন্ধার পাবে কি আলো?/ একথা কখনো জানবেনা তবু মৃত্যু হবে' (আত্মজীবনীর খসড়া)।

দুই

একজন কবিকে চিনে নেওয়ার সবচেয়ে বড় পন্থা ও স্মারক যদি হয় তাঁর উচ্চারিত কবিতা, মানুষ হিসেবে তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, স্বীকৃতি আর ব্যক্তিত্বের শিলমোহর যদি মুদ্রিত হয়ে থাকে তাঁর কবিতার পরতে পরতে, তা হলে বলতেই হয় শামসুর এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত, অন্তত আমার চোখে। তাঁর এই যে ঘোষিত অবস্থান 'এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার একধরনের অহংকার', এর মধ্যে আমি কণামাত্র অহঙ্কারের খোঁজ পাই না, যা পাই তা হল অগাধ আত্মবিশ্বাস, নিজের সম্পন্নতা বিষয়ে আস্থাবান একজন কবিমানুষের প্রত্যয়ী শ্লাঘা। অহঙ্কার যদি অহঙ্কারই হত, তা হলে তাঁর লেখায় প্রাক্তন ও সমকালীন কবি - কবিতাদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধানিবেদন বোধ হয় এতটা প্রাপ্তব্য হত না আমাদের কাছে। কবিতায় এবং গদ্যের সুবাদে সেই ঐকান্তিক তর্পণ - তালিকায় কে নেই? একদিকে যেমন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু শ্রদ্ধাময় সম্ভ্রম আদায় করে নিচ্ছেন তাঁর লেখনীয় মর্যাদায়, তেমনি পর্যায়ক্রমে স্মরণীয় স্মৃতি হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, অন্নদাশংকর রায়, গোপাল হালদার, সৈয়দ মুজতবা আলি, সন্তোষকুমার ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জসীমউদ্দিন, অরুণ মিত্র এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই স্মৃতিচারিতা ও ঋণস্বীকৃতির সৌজন্যেই ধরা পড়ে একজন ঐতিহ্যপ্রিয় কবির কবিমনের ঔদার্য। দু-চারটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক :

ক) আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভ'রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে — রবীন্দ্রনাথের প্রতি

খ) আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম।
অফলা সময় আসে সকলেরই মাঝে মাঝে, তাই
থাকি অপেক্ষায় সর্বক্ষণ। — বুদ্ধদেব বসুর প্রতি

গ) সত্যি বলতে কী, সে রাতে জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রায় পাগলের মতো পড়ার পর যে অপরূপ মুগ্ধতাবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল আমার চেতনায়, তাতে একদিনের জন্য ভাটা তো পড়েই নি, বরং আরো গভীর হয়েছে। আমার নিজের কবিসত্তার বিকাশের তাগিদে কখনও কখনও স্বেচ্ছায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার থেকে কিয়দ্দুরে থেকেছি কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখাইনি কস্মিনকালেও। তাঁর মতো লিখব না; কিন্তু তাঁর কবিতাবলি পড়বো বারবার, যতোদিন বেঁচে আছি। — আমার বনলতা সেন

ঘ) জসীমউদ্দীনের কবিত্বশক্তি এমনই প্রবল যে, তাঁর স্পর্শে সর্বদা পথে-ঘাটে দেখা নানা সামান্য বস্তু অসামান্য হয়ে ওঠে। আরো নতুন করে সেসব জিনিস দেখতে শিখি বলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি গাথাকাব্য রচনা করে বাংলাদেশের কাব্য সাহিত্যের এক শূন্যতা পূরণ করেছেন স্মরণীয়ভাবে। এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ তো বটেই, আজ অব্দি শ্রেষ্ঠ রূপকারও। — জসীমউদ্দিন

'পেয়েছি তোমার কাছে', 'আপনি শিখিয়েচেন', 'অপরূপ মুগ্ধতাবোধ', 'আরো নতুন করে সেসব জিনিস দেখতে শিখি'—বোঝাই যায় কথাগুলো শুধু আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নয়, নিছক বলার তাগিদ থেকে বলা নয়, গভীরতম উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত এদের প্রত্যেকটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যবন্ধ, শিক্ষার্থীর ভূমিকায় নিজেকে রেখে মহৎ প্রতিভাবানদের সজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখলেও তাঁর কবিতায় যে আচ্ছন্ন হতে চেয়েছিলেন আমৃত্যু, এ স্বীকারোক্তিমূলক তথ্যটি কবি হিসেবে তাঁর নিজের ওজনটিই যে বাড়িয়ে দেয়, সন্দেহ নেই কোনও।

তিন

বড় আবেগমন্দ্র আর স্মৃতিসিক্ত শামসুর রাহমানের উচ্চারণ, তাঁর বাগ্‌বিধি। কবিতাবলির শিরোনাম থেকেই প্রতীয়মান হতে পারে কতটা আবেগমথিত অভিঘাত থেকে জন্ম নিতে পারে তাঁর এক-একটি কবিতার বিষয়ভাবনা : 'দুঃখ', 'কখনো আমাকে মাকে', 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', 'শান্তি পাই', 'তোমার স্মৃতি', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'অভিমানী বাংলাভাষা', 'রঞ্জিতাকে মনে রেখে' কিংবা 'বেড়ালের জন্য কিছু পঙ্‌ক্তি'। কখনও এই আবেগের মধ্যে লগ্ন হয়ে থাকে নিহিত অভিমান ('মনে পড়ে, দিকচিহ্ন, গেরস্থালি, নক্ষত্র দুলিয়ে/ অভিমানী বাংলাভাষা সে কবে বিদ্রোহ করেছিলো'), কখনও দুঃখের আর্তীকরণ ঘটে যায় গার্হস্থ্য প্রেক্ষিতে ('আমাদের বারান্দার ঘরে চৌকাঠে/ কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে/ দুঃখ তার লেখে

নাম'), দেশাত্মবোধে আক্রান্ত হয়ে অন্যমাত্রিক হয়ে ওঠে অনুভব ('তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,/ তোমাকে পাওয়ার জন্যে/ আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?/ আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?'), কখনও উচ্চারণের বীজভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে প্রচ্ছন্ন প্রেমার্তি,—

হয়তো কখনো আর কলকাতায় যাবো না এবং
তুমিও ঢাকায় আসবে না। তাহলে কোথায় বলো
দেখা হবে আমাদের পুনরায় অচেনা পথের কোন্ মোড়ে?
মস্কো কি পিকিং-এ নয়, ওয়াশিংটনেও নয়, ব্যাঙ্কক জাকার্তা
জেদ্দা কি ইস্তামবুল, হামবুর্গ' কোনোখানে নয়।
আমরা দু'জন
হয়তো মিলিত হবো নামগোত্রহীন
উজ্জ্বল রাজধানীতে কোনো, যাকে ডাকবো আমরা
মানবতা বলে,
যেমন আনন্দে নবজাতককে ডাকে তার জনক-জননী। রঞ্জিতাকে মনে রেখে

এ সব দৃষ্টান্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়া জরুরি তাঁর আরও দুটি কবিতা, —বাবা ও মা-কে নিবেদিত—যাদের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে আছে ওই আবেগ, আবেগঘন স্মৃতিচর্যা। 'পিতার প্রতিকৃতি'-র সামনে দাঁড়িয়ে এই তাঁর অনুভবী সংবেদনা, উদ্ধৃত করে দিচ্ছেন বাবারই কথাগুলো, যখন তিনি রোদ্দুরে চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে আর থাকবেন না এই রহস্যময় পৃথিবীতে,

'তখন থাকবে তুমি আমার সন্তান
—দীর্ঘজীবী হও তুমি,
তোমার কর্মঠ আঙুলের উষ্ণ রক্তে ঘন ঘন
আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি
এক ঝাঁক হাঁসের মতোই জানি
নিপুণ সাঁতার কেটে তোমাকে জাগাবে স্বপ্ন অনিদ্রার রাতে—।'

আমার মা-কে নিয়ে যে-কবিতা—'কখনো আমার মাকে'—যা ইতিমধ্যেই সাড়াজাগানো মর্মস্পর্শী একটি নিবেদন, যেখানে নিশ্চুপ নেপথ্যচারিণী মায়ের সকরুণ আলেখ্য, তার অন্তিম স্তবকটি তো প্রায় অশ্রুসঞ্চারী : 'যেন তিনি সব গান দুঃখ- জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে/ রেখেছেন বন্ধ ক'রে আজীবন, এখন তাদের/ গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয়, শুধু/ ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে!'

'কে জানতো স্মৃতি এতো/ অন্তরঙ্গ চিরদিন?' এ-প্রশ্নকাতরতা ছিল 'রৌদ্র করোটিতে' গ্রন্থের 'একটি মত্যুবার্ষিক' কবিতাটিতে। স্মৃতিমেদুর অনুষঙ্গ থেকে বোধ হয় কোনেও কবিরই পরিত্রাণ নেই, থাকবার কথাও নয়, কারণ স্মারণিক উপজীব্য থেকেই তো অনেক কবির অনেকরকম উপকরণ ছেঁকে নেওয়া, সেই বহুশ্রুত 'Longing lingering look behind'-এর অনূদিত রূপায়ণ। শামসুরও নন কোনও অর্থেই তার ব্যতিক্রমী নজির। গদ্যে, কবিতায় বারেবারে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে হারানো অতীতে, ছেলেবেলায়, বিগত দিনের নস্ট্যালজিয়ায়। গদ্যের কথায় একটু শুনে নিই,—

'পুরনো ঢাকায় আমি পুরনো ইতিহাসের নিশ্বাস এবং দীর্ঘশ্বাস শুনতে পারি। দেখতে পাই আমার না-দেখা অনেক ঘটনার ছায়ার মিছিল। মোগল সেনাদের কুচকাওয়াজ, নায়েবে নাজিমের ঝলমলে পোশাক, শায়েস্তা খানের আসা - যাওয়ার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শহরবাসী, আন্টাগড়ের ময়দানে ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত সিপাহীর লাশ, পগোজ স্কুল প্রাঙ্গণে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঢাকাবাসীদের উদ্দেশে কবিতাপাঠ, পাটুয়াটুলীর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে জীবনানন্দ দাশের বিবাহ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণসমাজে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা অনুষ্ঠান, আহসান মঞ্জিলের নবাবদের দরবার, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নায়কদের আসর আমাকে স্বপ্নময় করে তোলে। আমার স্মৃতিকে আলোড়িত করে শৈশবে দেখা মহরম ও জন্মাষ্টমীর মিছিল।"

রচনাটির নাম ছিল 'আমার জন্মশহর, শ্মৃতির শহর', ফেলে - আসা ইতিহাসের ধূসর পাতা যেখানে তিনি উলটে যাচ্ছেন একটার পর একটা, ভারাক্রান্ত হচ্ছেন লুপ্ত অতীতরোমন্থনে, শাহরিক স্মৃতিচর্চায়। আর যখন আত্মজৈবনিক তন্ময়তায় ডুব দেন ফেলে আসা দিনগুলোয়, তখন বিষণ্ণতার মধ্যেও ভেসে ওঠে এক টুকরো আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা:

ভগ্নস্তূপে স্থির আমি, ধ্বংসচিহ্ন নিজেই যেন বা;
ভস্ম নাড়ি জুতো দিয়ে, যদি ছাই থেকে অকস্মাৎ
জেগে ওঠে অবিনাশী কোনো পাখি, যদি দেখা যায়
কারুর হাসির ছটা, উন্মীলিত স্নেহ ভালোবাসা। এখানে দরজা ছিল

চার

ছোট্ট একটা উপমা, অব্যর্থ চিত্রকল্প কিংবা একটি গণবদ্ধ বাক্‌প্রতিমা কতখানি ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলতে পারে কবিতার শরীর, কতটা আলোকিত করতে পারে একজন কবির উচ্চারণ, শামসুর রাহমানের অজস্র কবিতা তার যথাযোগ্য নিদের্শন। অবিরল চিত্রধর্মী ডিক্‌শনের আশ্রয়ে কথা বলতেই যেন তিনি স্ফূর্তিবোধ করেন বেশি, উপমাপ্রয়োগে কবিতাকে পৌঁছে দিতে চান তার নিজস্ব গন্তব্যে, উচ্চারণের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে দেন ছবির পর ছবি। আমার এ-মন্তব্যের সমর্থন যেন তাঁর নিজের জবানিতেই,—

নিপুণ গার্ডের হুইসিল বাজাতে বাজাতে সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ - শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে - না-দিতেই
কিছু পঙ্‌ক্তি পেয়ে বসে আমাকে আবার। দুর্দান্ত
একপাল জেব্রার মতো ওরা আমার বুকে ধুলো উড়িয়ে বারংবার
ছুটে যায়, ফিরে আসে। একপাল জেব্রা

'সবুজ ফ্ল্যাগ' আর 'একপাল জেব্রা'র মধ্যে যে আমরা পেয়ে যাই চিত্রবিচিত্র বর্ণিল চিত্রকল্পেরই অবধারিত আভাস। সমগ্র কবিতার অবয়বে চিত্রধর্মী উপমার প্রয়োগ এতটাই অনিবার্য যে এদের অভাবে এক-একটি কবিতার মেজাজটাই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়, মনে হয় বাদবাকি কবিতাটির নির্মাণ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, 'জনৈক সহিসের ছেলে বলছে' কবিতাটিতে এই যে দুটি অপ্রচল চিত্রকল্প— 'ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ' এবং 'জকির শার্টের মতো দিন'— গোটা কবিতাটির বিষয়ভাবনাকে বুঝি এরাই ধারণ করে রেখেছে : 'আমার সমান - বয়সী দুঃখ দেখি/ বসে আছে চুপ নিথর আঁধার ঘরে' (সান্ধ্য আইন); অথবা 'নো এক্সিট' কবিতায় যেখানে চলে যাওয়ার একটা সঙ্কল্প ঘন হয়ে ওঠে, সেখানে বড় জরুরি মনে হয় এই বাক্‌প্রতিমার উদ্ভাস : 'আমাকে যেতেই হবে যদি, তবে আমি/ যীশুর মতন নগ্ন পদে চলে যেতে চাই।' বলতে দ্বিধা নেই, এক-একটি চিত্রকল্প প্রয়োগনৈপুণ্যে এককভাবে চরিত্রবান, ব্যঞ্জনাময়, অর্থদ্যোতক,—

ক। বর্ষিয়সী এক মহিলা, চোখ দুটো ভরা দুপুরে
হারিকেনের আলোর মতো নিষ্প্রভ — বংশধর

খ। কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ত চোখের মতো
ছলছল করে... — সন্ধ্যা

গ। স্মৃতির মতন কে অনুপম স্বপ্নিল বারান্দা
থাকে পড়ে অন্তরালে অন্তহীন, কবি নেই তার — বুদ্ধদেব বসুর প্রতি

ঘ। ঘূর্ণ্যমান পুরোনো কাগজ
ল্যাম্পোস্টের নিচে খুব শীতকাতুরে পাখির মতো
পড়ে আছে — একটি বিনষ্ট নগরের দিকে

ঙ। আমার বয়স তস্করের মতো চতুষ্পার্শ থেকে
এলেবেলে কত কিছু নিয়ে যায় ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় স্মৃতির গুহায় — আমার বয়স আমি

চ। 'বলো তো এমন কেন হবে' বলে কেউ
ছাগলের চামড়ার মতো স্তব্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে কিছুক্ষণ হাসে ফিকে
হাসি — কেউ কি পালিয়ে যায়

ছ। তখন কাঁচা দুধের ফেনার মতো ভোরের শাদা আলোয়
বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো আর্তনাদ করতে করতে
হঠাৎ বিদ্রোহ হয়ে ওঠে — বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো

জ। পাখির ডানার
শব্দে সচকিত
সকালবেলার মতো শৈশব
প্রত্যাবর্তনের দিকে ফেরাবে না মুখ
কস্মিনকালেও। — দশ টাকার নোট এবং শৈশব

এই উদ্ধৃতিগুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত করতে ইচ্ছে করে শামসুরের বহুপঠিত দীর্ঘকবিতা 'ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৬৯'-এর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, যেখানে জীবনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে আপাত - অসংলগ্ন আনুপূর্বিক কয়েকটি ছবি, মন্তাজের মতো, অনেকটা নির্মাণরীতিতে 'mixxed metaphor'-এর আদল যেখানে,

জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
জীবন মানেই
খুকির নতুন ফ্রক নক্সা তোলা, চারু লেস্ বোনা,
জীবন মানেই
ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আচঁড়ানো,
প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা;
জীবন মানেই
হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,
জীবন মানেই
গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান...

পড়তে পড়তে দীক্ষিত পাঠকের কাছে স্মারক হয়ে উঠতে পারে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি দীর্ঘ কবিতা, যার শিরোনামই ছিল 'জীবন'। ৩৪টি স্তবকে বিধৃত ছিল যে-নিবেদন, অজস্র উপমা- অনুষঙ্গে যেখানে কবি জীবনের পাঠ নিচ্ছেন নানা দৃষ্টিকোন থেকে, নানা সৃষ্টিকোণ থেকে। এভাবেই হয়তো একজন কবি বেঁচে থাকেন, বেঁচে ওঠেন, আরেকজনের হাত ধরে, অনুস্মরণে, পরম্পরায়, ধারাবাহিকতায়। শামসুর জীবনানন্দের মতো লিখতে চাননি, কিন্তু অগোচরে এক-একটা কবিতায় জীবনানন্দের ছায়াপাত যখন ঘটে যায়, একজনের খুব কাছাকাছি নিশ্বাস নেয় আর একজন, তখন আমরা স্তব্ধবাক হয়ে পড়ি, আমাদের যাবতীয় কথা হারিয়ে যায়, আর সেই স্তব্ধতাকে চিরেই বোধ হয় বাঙ্ময় হয়ে উঠে এক-একজন কবির মহার্ঘ উচ্চারণ।